Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 290 – 297
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড' : এক নারীর দেশপ্রেমের আখ্যান

ড. শ্যামাশ্রী মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
শহীদ অনুরূপ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়
Email ID : shyamasri.mondal@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Selina Hossain, Buri, freedom, Hangor, Nadi, Granade, Haldigram, Bangladesh, war, fighter.

Abstract

One of the important, popular literary scholar of Bangladesh is Selina Hossain. She started to write literature from her school life. She is known to the reader not only in India, but also in foreign through the translation of her writings. The main theme of her writings are the political conditions of Bangladesh, the situation of society, environmental hazardds, the life style of poor class people, revolt for language, fight for freedom and above all her own personal experiences. The greatest political turmiol of Bangladesh is fight for freedom in 1971. She was very much affected with this battle, She wrote many stories and novels on this theme; the most popular and important novel of this category is 'Hangor Nodi Graned. She wrote this novel under a true incident – "a mother of Kaligunge Village of Joshare sacrificed her own son during the freedom fight of Banglaesh in 1971". Jashore district is the 8th sector among the 11th sectors of freedom fight of Bangladesh. The real name of the village (Kaligunge) is changed , It is Haldi Gram in this novel. Selina Hossain is introduced with this incident by her freedom fighter, teacher, Professor Abdul Hafiz.

In the novel 'Hangar Nadi Granade' we find the overall picture of a female character named Buri. She was born in a remote village named Holdi Grame. Although Buri was the youngest child among twelve brothers and sisters she did not get sufficient love from her family. She grew up without love and her unliked name. She had strong feelings for the distance. she had a dream, a wish for going outside of her house under the marriege. But she was married to her uncle's son, beside her own house, in the village. So all her wishes was unfulfilled. She adjusted herself in her marriage life. She had three son, Salim, Kalim who were her step sons and Rais who was her own son, was handicaped. So goldern rose did not bloom in her life. During the freedom fight of Bangladesh Old Biru gains a new tide in her life. Everything changes in fornt of her eyes. Boys becames worker forgetting their play. Young ages prepared themselves for a greater works. They wants to sacrifice their life for their countries's freedom. Buri's elder sons were freedom frighter. Buri took courage to lead a new life. The freedom frighter of her villager ignored Buri, as she is an old person. The first politrical blow came to her life when her elder son salim left the village. the second blow came when

militant arrested and killed her younger son Kalim. At first she was shocked but later she felt proud for her son's bravery. Every villagers left the village due to the ill treatment of militant. but Buri still lived in her own house. At the end of the novel we came to see that she handed over her own beloved handicapped son to her enemy to save two freedom frighters as their life was more valuable than that of her hadicapped son. Her loves for country is real. He felt that only the freedom frighter can rescus the country from the hand of enemy. So at the end of the novel she is the real hero. She did not want to defeat the freedom frighter. She became a real patriot. So the novel had become a tale of a patriotism of a woman.

Discussion

বাংলাদেশের একজন উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হলেন সেলিনা হোসেন।।স্কুল জীবন থেকে কবিতা চর্চা শুরু করলেও, বিশ শতকের ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে পাঠক মহলে পরিচিতি লাভ করেন, এরপর থেকে তিনি নিরন্তর লিখে চলেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে তাঁর অবদানের শেষ নেই। অনুবাদের মাধ্যমে শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও তাঁর নাম ও লেখার সঙ্গে পাঠক সমাজ পরিচিত। তিনি একজন কর্মী, দেশপ্রেমী লেখক, লেখার মাধ্যমে তিনি প্রতিবাদ করেন। তাঁর লেখা আমাদের জীবনের গভীর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর সাহিত্য অনন্য, তিনি প্রত্যেকটি লেখার জন্য নতুন করে তৈরি হন, তাঁর লেখা বহুমাত্রিক। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশের রাজশাহী শহরে। বাবার বদলির চাকরির জন্য তাঁর পরিবার ভ্রাম্যমান জীবন অতিবাহিত করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়েই তাঁর উচ্চশিক্ষা অর্জন, সুতরাং প্রথম থেকেই তিনি সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। বাংলাদেশের এক অস্থির সময়ে তিনি বড় হয়েছেন। ১৯৪৭ সালে আগস্টে ভারত থেকে আলাদা হলেও পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্থানের উর্দভাষী মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। নানা কারণে বার বার সংঘর্ষ হয়েছে – এ সবই তাঁর জানা। দেশভাগের পর বাংলাদেশের জনগণকে নতুন করে সব সাজাতে হয়েছে। সাহিত্যের চর্চাও আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হয়েছে। বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, নিজের ব্যক্তি জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই তাঁর সাহিত্যের পটে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অভিঘাত হল মুক্তিযুদ্ধ, এই যুদ্ধ তাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে লেখা তার বেশ কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সারা জাগানো উপন্যাস হল 'হাঙর নদী গ্রেনেড'।

হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) উপন্যাসটি তাঁর সাহিত্য চর্চার প্রথম দিকের উপন্যাস'। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা বা মুক্তি যুদ্ধের সময় কালের যশোরের কালীগঞ্জ গ্রামের এক মায়ের আত্মত্যাগের সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখিকা এই উপন্যাসটি রচনা করেন। যশোর জেলা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরের মধ্যে ৮ নং সেক্টর। তবে আলোচ্য উপন্যাসে প্রাধান্য পাওয়া গ্রামটির নাম কালীগঞ্জ নয়, হলদী গ্রাম। খুব পুরানো ইতিহাস নয়, কয়েক বছর আগে ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটি। এই উপন্যাসটি লেখার প্রেরণা সম্পর্কে এক সমালোচক বলেছেন –

> "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, যিনি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং লেখিকার শিক্ষক ছিলেন। তিনি লেখিকাকে এই ঘটনা বর্ণনা করেন এবং একটি গল্প লিখতে বলেন। প্রথমে ছোটগল্প লেখার কথা ভাবলেও লেখিকা এই গল্পের বিস্তৃতি ঘটান। শুরু করেন 'বুড়ি' নামের একটি প্রতিবাদমুখর চরিত্রের শৈশব দিয়ে, আর শেষ করেন তাঁর নিজের ছেলের বিসর্জন দিয়ে।"[১]

তিনি আসলে ইতিহাস থেকে তথ্য পেয়েছেন, সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে 'বুড়ি'র জীবনের কথা লিখেছেন। এই উপন্যাসটি তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তাঁর এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন –

> "কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের এই উপন্যাস পড়ে ব্যাপকভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৫ সালের ১৩ আগস্ট সেলিনা হোসেনকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে উপন্যাসটির প্রশংসা করেন এবং একটি ভালো চলচ্চিত্র হবে বলে ব্যক্ত করেন তিনি। মূলত তিনি চলচ্চিত্রে রূপদানের বিষয়ে আগ্রহীও ছিলেন এবং সেলিনা হোসেনের সাথে দেখা করতে বাংলাদেশেও আসতে ছেয়েছিলেন।"[২]

কিন্তু তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়নি, রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিকূল ছিল, অনেকে আপত্তি করেন। পরবর্তীকালে **১৯৯৭** সালে বাংলাদেশের সিনেমা পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এটি ইংরেজি, মালয়ালাম ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলেন 'বুড়ি' নামে এক নারী চরিত্র। তার জীবনের একটা সামগ্রিক ছবি এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের এক প্রান্তিক এলাকা হলদী গাঁয়ে তার জন্ম। এইখানেই তাঁর বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য কাল অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম থেকে তার কোনো সাধ পূরণ হয় না। উপন্যাসের শেষে দেশের জন্য কিছু করতে চেয়েছে, বার্ধক্যের জন্য কেউ তাকে নেয় না, কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজের পঙ্গু ছেলের প্রাণের বিনিময়ে দুই মুক্তি যোদ্ধাকে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করেছে। বারো ভাই বোনের সবচেয়ে ছোট বলে বাবা আদর করে তার নাম রেখেছিল, বুড়ি। নামটা তার পছন্দ হয়নি। সবার ছোট হয়েও বাড়তি কোনো ভালোবাসা সে পায়নি। নিজের বাড়ি, মাঠ-ঘাট, আগান - বাগানের মধ্যেই ঘুরে ফিরে তার জীবন কেটেছে–

> "হলদি গাঁয়ের এ বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যাবার সুযোগ হয়নি ওর। পশ্চিমে স্টেশনে যাবার বড় রাস্তা। পুবে খালের ধার, উত্তর দক্ষিণে মাঠের পর মাঠ। এর বাইরে কি আছে বুড়ি জানে না। বুড়ি বড় ভীষণ নিঃসঙ্গ। একদল ভাই-বোনের মধ্যে থেকেও বুড়ির মন কেমন করে। সে মনের কথা কেউ বোঝে না। বুঝতে চায় না। যে মনের ডানা অনবরত রঙ বদলায় তাকে বুঝবে কে?"[৩]

একদিন সে, প্রতিবেশী এক ছেলে জলিলের সঙ্গে গ্রামের পশ্চিমের পথ ধরে স্টেশনে চলে যায়। তার জিজ্ঞাসু মনের কাছে স্টেশন হল রূপকথার জগত। তার মনে নানা সাধ, প্রচণ্ড কৌতূহলী, একদিন ট্রেনে করে কোথাও চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু কোনো ইচ্ছা পূরণ হয় না। তার গভীর চিন্তাশক্তি, কল্পনাপ্রবণ ও কৌতূহলী মন তাকে সবার থেকে আলাদা করে দেয়, "কেবলই জানতে ইচ্ছে করে খাল কোথায় শেষ হয়, পথ কোথায় ফুরিয়ে যায়। আর তখনই কেমন বিচ্ছিন্ন ভাবনায় বুক মোচড়ায়। মনটা জল থৈ থৈ ঝিলের মতো ছ্প ছ্প করে"[৪].. সমবয়সী খেলার সাথীরা যেমন ওর নাগাল পেত না, ওকে বুঝতে গিয়ে হিমশিম খেত – তেমনি বড়রাও ওকে কাছে টানতে পারেনি। বাড়ির দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে উন্মুক্ত প্রান্তর, খালের ধার, জামরুল গাছের তলা তার অনেক প্রিয়। নির্বাক গাছ গাছালি তার প্রিয়। জীবনের কৈশোর কাল পর্যন্ত তার মনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হয় না, বাবার হঠাৎ মৃত্যু হলে বড় দাদা বুড়িকে বাড়ির পাশেই তাদের নিজের কাকার বিপত্নিক বয়স্ক ছেলে গফুরের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়, বুড়ির মতামত না নিয়ে, মার আপত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে।

> "বুড়িকে কোনরকম একটা বিয়ে নামক বন্ধনের মধ্যে ঠেলে দেয়াই ছিল তার লক্ষ্য। বুড়ির স্বভাব এবং আচরণ কোনটাই তার দাদার পছন্দ ছিল না।"[৫]

বুড়িও মেনে নেয়, কারণ সে তো অন্য কাউকে ভালোবাসেনি। কিন্তু বিয়েকে কেন্দ্র করে তার সুন্দর স্বপ্ন ছিল –

> "ভেবেছিল আর কিছু না হোক এক গাঁ ছেড়ে আর এক গাঁয়ে যাওয়া যাবে অন্তত। একটুখানি পাগলা হাওয়া বাইরে যাবার ডাক শোনাত। গাঁয়ের বেড়িটা ভাঙতে পারবে। নৌকার ছইয়ের ভেতর বসে ঘোমটার ফাঁকের বিমুগ্ধ দৃষ্টি ওকে স্বস্তি দেবে। কোন অপরিচিত জনের লোমশ হাত বুড়ির জীবনের বাঁকবদলের মাইলস্টোন হয়ে দাঁড়াবে। পান খাওয়া লাল দাঁতের হাসি ছাড়া বুড়ির জন্যে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।"[৬]

কিন্তু কোন ইচ্ছেই পূরণ হয়নি ওর। চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার ফলে উত্তরে ঘর থেকে দক্ষিণের ঘরে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছিল মাত্র। তবুও সে স্বামীর সংসারে সুন্দর ভাবে মানিয়ে নেয়, আগের পক্ষের দুটি ছেলে সলীম ও কলীমকে নিজের করে নেয়, ভালোবাসা দেয়। তার স্বামী খুব ভালো মানুষ, তাকে সারাক্ষণ আগলে রাখে। কিন্তু স্বামী

কখনো তার মনের মানুষ হতে পারেনি। জীবনে কিছুই তার পাওয়া হয় না, মনের তৃষ্ণা তার মেটে না। রাতের অন্ধকারে বিছানা থেকে সে উঠে গিয়ে ঘরের বারান্দায় বসে থাকে, উদাস হয়ে যায়। বুড়ি মানসিক দিক থেকে মুক্ত কিন্তু শারীরিক ভাবে আবদ্ধ। বয়স্ক স্বামী তার কিশোরী বউয়ের আচরণ দেখে অবাক হয়ে যায়। কল্পনাপ্রবণ, উদাসী স্ত্রীকে খুশি করার জন্য নৌকায় করে রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিত। নৈশ্য অভিযানে বেড়িয়ে যেত। ছোটবেলার সাথী জলিলের বিয়ে করা বউকে নিয়ে শহরে চলে যাওয়া – বুড়ি মেনে নিতে পারে না। কারণ তার আর কোথাও যাওয়া হয় না, ভাবে জলিল তার নিজের হলে সে স্থানান্তরে যেতে পারত। নিজের সতীনের ছেলে থাকা সত্ত্বেও সে নিজের সন্তানের মা হতে চায়, কিন্তু তার স্বামী চায় না। বউয়ের জেদের কাছে হার মানে, অনেক সাধনা করে, শ্রীনাইল ধামে মানত করে তার ছেলে হয় কিন্তু সে পঙ্গু হয়। জীবনের সোনার গোলাপ আর ফুটল না, বুড়ির জীবন বদলে যায়, সব আশা শেষ, অন্যদিকে দিনে দিনে গফুরের বয়স বাড়ে, তার মনও রুক্ষ হয়ে ওঠে। একদিন সে মারা যায়। বুড়ি একদম একা হয়ে যায়, সারাদিন সংসারের কাজ করে যায়। তিন ছেলের জন্য কাজ করে যায়। সংসারে প্রথম বড় ছেলের বউ আসে।

স্বামীর অবর্তমানে বড় ছেলে সংসারের কর্তা হয়ে ওঠে। সেও দিনে দিনে বদলে যায়, খিটখিট করে, স্ত্রীকে মারধর করে। ছেলের বদলে যাওয়ার কারণ সে জানে না। সলীম বাড়ির বাইরে বেশি সময় কাটায়, এর কারণ তার মার জানা নেই, কলীমকেও বিয়ে দিতে চাইলে দুইজনেই আপত্তি করে বলেছে –

> "তুমি তো জাননা দেশের অবস্থা এখন একদম ভাল না' ... (মা বলে) –'ওমা দেশের আবার কি হলো? জ্বর এলো নাকি? বুড়ি হেসে ওঠে'।"[৭]

বুড়ি দেখে দেশে যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে, তার ছেলেরা বদলে যায়, তারা বাড়িতে বেশি সময় কাটায় না। সলীম আজকাল গাঁয়ের একজন মাতব্বর গোছের লোক হয়েছে। তার গুছিয়ে কথা বলা, তাকে প্রাণিত করে, নিজের পেটের ছেলে না হলেও সলীম ও কলীমের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ আছে, দেশের কাজে তাদের আত্মত্যাগে বুড়ি গর্ব বোধ করে। বার বার ছেলেদের কাছে দেশের কথা জানতে চেয়েছে, "হ্যাঁরে বাবা কি হয়েছে দেশটার? জন্মাবার পর থেকে তো কিছু হতে দেখলাম না" কলীম মাকে গভীর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় –

> "দেখ এবার আমাদের একটা যুদ্ধ করতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে, 'যুদ্ধ' শব্দটা তাকে ভাবিয়ে তোলে, দেশ স্বাধীন হবে আবার কী? এসব ব্যাপার তার কাছে নতুন, দেশের কথা তার জানার কথা না, বুড়ি ভাবে যুদ্ধ কি? যুদ্ধ কখনো দেখেনি বুড়ি? গফুরের সঙ্গে বিয়ের ক'দিন পর শুনেছিল দেশ স্বাধীন হয়েছে। তখন কোনো যুদ্ধের কথা বার্তা হয়নি, গাঁয়ের লোক এমন গম্ভীর হয়ে যায়নি। সলীমের মত থমথমে আচরণ করেনি। ... মোটকথা একটা দারুণ ধুমধাম হয়েছিল। সবার মনে ফূর্তি ছিল। কিন্তু এখন কেন স্বাধীনতা মানে যুদ্ধ সলীম কলীম কেন এমন বদলে গেল? কি হল দেশটার? নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু। নইলে বিয়ে পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে কেন?"[৮]

দেশের সংকটময় মুহূর্তে, বুড়িকে আমরা নতুন উদ্দপনায় মেতে উঠতে দেখি, দেশের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করে। একদম ভয় পায় না। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র, মৌলিক। ছন্দহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনে জোয়ার আসে। বাঁচার নতুন প্রেরণা পায়, বোঝে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, এর সঙ্গে মানুষের যোগ আছে, সবাই ভাবছে, ভাবনায় পড়েছে, ভয় না পেয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বুড়িও ঘরে বসে থাকে না –

> "হলদি গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় অনুভব করে হলদী গাঁয়ে চিরকালীন শান্ত সংযত কর্মপ্রবাহে জোয়ার এসেছে। মুখ বুঝে সয়ে যাওয়া, ঘা খেয়ে মাথা নোয়ান মানুষগুলোর কণ্ঠে এখন ভিন্ন সুর, চোয়ালে ভিন্ন আদলের ভঙ্গি।"[৯]

প্রতিবেশী বৃদ্ধ রমজাম আলী তাকে জানায় তাদের প্রতিজ্ঞার কথা, তাদের লড়াইয়ের কথা। একটা অন্য রকম অনুভূতি হয় তার, কুকুর, বাঘাকে উদ্দেশ করে সে বলে -

> "আমার শরীরটা অন্য কথা বলে। আমি ধরতে পারছিরে বাঘা, এ খরা বা বন্যা নয়। এ অন্য কিছু একদম অন্যরকম;"[১০]

এই নতুন অনুভূতিতে তার মন আনন্দে ভরে ওঠে, কিছু করার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু ছেলেরা তাকে গুরুত্ব দেয় না। বুড়ি নিজের পরিবাবের কথা ভুলে দেশের কথা, গ্রামের কথা ভাবতে থাকে –

> "বুড়ি খালের পানিতে হাট ভেজায়, গালে ডলে, চোখে মাখে, মাথায় দেয়, যদি পানি তাকে কোন নতুন কথা বলে দেয়? যদি বলে কেন হলদী গাঁয়ের প্রাণ বদলে যাচ্ছে, কোন অমোঘ শক্তির টানে হলদী গাঁ তার আপন স্বরূপের বাইরে পা বাড়াচ্ছে। কে তাকে এমন সাহসী বেগবান এমন যৌবনবতী করে তুলল?"[১১]

বুড়ি অনুভব করে শুধু গ্রামের মানুষ বদলে যায়নি দেশের মুক্তি-সংগ্রামে হলদী গাঁয়ের প্রাণ বদলে যাচ্ছে। বুড়ি গ্রামের কমবয়সী ছেলেদের বদলে যাওয়া দেখেছে। নেংটি পরা ছেলেগুলো আর দুষ্টুমি করে না, চপলতাও নেই তাদের মধ্যে, নতুন ঢঙে কথা বলেছে। পেট ভরে খেতে না পাওয়া ছেলেগুলোর মধ্যে অসুরের শক্তি দেখা যায়, এরা দেশের জন্য লড়াইয়ের জন্য প্রতিদিন প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, নিজের পালিত দুটো ছেলে দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছে। এই দামাল ছেলেদের পাশে নিজের পঙ্গু ছেলেকে অকেজো, অকর্মন্য মনে হয়, ও কোনো কাজে লাগবে না, ভেবে তার মন ভেঙে যায়। গ্রামের মানুষদের জেগে ওঠাকে তাদের বদলের ব্যাপারটা বোঝাতে উপমা হিসেবে শিমূল গাছের প্রসঙ্গ এনেছে –

> "হঠাৎ মনে হয় শিমূলের গোটা আচমকা ফেটে গিয়ে যেমন তুলোগুলো দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে তেমনি হয়েছে হলদী গাঁয়ের অবস্থা। গাঁয়ের মনুষ গুলোর বুকের ভেতর জমিয়ে রাখা শিমূল বীজ ফাগুনের গরম বাতাসে আচমকা ফেটে গেছে। মানুষগুলো উজ্জ্বল, ছুটছে একটা লক্ষ্যের দিকে। তাদের লক্ষ্য শিমূল তুলোর মতো সাদা, হালকা সাদা, মানুষগুলোর চেহারা রক্তাভ, লাল।""[১২]

বুড়ি ছটফট করে, ওরা কেন কেউ কিছু বলছে না ওকে, কি যে হচ্ছে সারা গাঁ জুড়ে? বাইরের ডবকা ছেলেগুলো সামনে গেলে ভাগিয়ে দেয়। তাদের ধারণা বুড়োরা কোনো কাজে লাগবে না। ভীন দেশি শাসকদের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, ওরা উঠতে উঠতে তাদের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে গেছে। বুড়ি বুঝতে পারে একটা কিছু করার জন্য সবাই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে কঠিন তপস্যার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছে, বুড়ির বড় ছেলে নিজের বৌ বাচ্চার দিকে তাকিয়ে দেখে না, মা অভিযোগ করলে সে বলেছে - স্বাধীনদেশে তার সন্তান যাতে মাথা তুলে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে তার চেষ্টায় সে আত্মনিয়োগ করেছে।

রেডিওতে দেশবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কণ্ঠস্বর শুনে বুড়িরও বুড়ো বয়সে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। দেশের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি না বুঝলেও 'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম – এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' মুজিবরের ভাষণের এই দুটি লাইন তাকে মাতিয়ে তোলে। বুড়ি এটুকু বুঝেছিল-

> "একটা মানুষ ওদের সকলের হয়ে কথা বলছে। একদম ওদের হৃদয়ের কথা। হলদী গাঁয়ের মাঠ, ক্ষেত ফসল, গাছ গাছালি, গরু ছাগল, পাখ পাখালি এবং মানুষের কথা। সিরাজমিয়া কথাগুলো ধরে রেখেছেন।"[১৩]

বুড়ি তার অনুভূতির কথা বৌমা রমিজার উদ্দেশে বলে-

> "ওরা যখন জয় বাংলা বলে চেঁচিয়ে ওঠে মনে হয় আমার প্রাণটা ধরে কে যেন নাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন ডাক আর হয় না রমিজা রমিজারে তুই অনেক কিছু বুঝিস না। আয় আমরা চিৎকার করে বলি, জয় বাংলা,"[১৪]

বুড়ি হলদী গাঁয়ের কথা ভাবতে থাকে। দেশের কথা ভাবে।

শাসকশ্রেণি চুপ করে বসে থাকে না, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরার জন্য, স্বাধীনতা আন্দোলনকে পণ্ড করে দেবার জন্য বাংলাদেশের শহরে ও গ্রামে গ্রামে মিলিটারি বাহিনীর আবির্ভাব ঘটে। যোদ্ধাদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে নিজেদের গ্রামের লোকেরাই, সুতরাং বাইরে শত্রু ঘরে শত্রু, এই দিক দিয়ে নামকরণ সার্থক হয়েছে, 'হাঙর' আর 'গ্রেনেড' হল শত্রুর প্রতীক, আর 'নদী' হল নিজের জন্মভূমির প্রতিরূপ, কারণ বাংলাদেশ হল নদীমাতৃক এলাকা। বাংলার বুকে তাণ্ডব চলে, যুবকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়, বিশেষ করে মেয়েদের জীবন বেশি বিপন্ন হয়, তারা মিলিটারিদের লালসার শিকার হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে আমরা দেখি বুড়ির প্রতিবেশী মনসুর আলী বুড়ির বড় ছেলে সলিমের নামে শাসকশ্রেণির কাছে অভিযোগ করে, সলীম ছোট ভাইকে সংসাসের দায়িত্ব দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। শহর থেকে জলিল ফিরে আসে, মিলিটারিদের ধরিয়ে দেওয়া আগুনে তার বৌ মেয়েরা পুড়ে মরে। সলীমের যাবার ক'দিনের মধ্যে মিলিটারি বাহিনী হলদী গ্রামে প্রবেশ করে। সলীমকে খুঁজে না পেয়ে কলীমকে নিয়ে যায়, দাদার হদিশ না বলার জন্য সে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেও নিস্তার পায়নি, তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, তার মার সামনে

নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তাদের বাড়িতে গিয়ে অস্ত্রের সন্ধানে তল্লাসী চালায়, বুড়ি কিছুই করতে পারেনি, কলীম তাকে মা বলেই জানে, কিন্তু তার প্রতি বুড়ির গভীর ভালোবাসা ছিল না, বুড়ি আত্মসমালোচনা করেছে, খেদ করে, কলীমের আত্মত্যাগ তাকে প্রাণীত করে। সলীমের যুবতী বউ লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়, সাজানো সংসার ভেঙে যায়, মাঠে বাঁধা বুড়ির গরুকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে যবাই করে। সলীম পলাতক, কলীমের মৃত্যু ঘটেছে, বৌ বাপের বাড়ি আর ছোট ছেলে বোবা কালা সুতরাং বুড়ির আর কিছুই হারানোর নেই। প্রতিবেশী রমজানের মিঞার দুই ছেলে কাদের ও হাফিজ যুদ্ধে চলে যায়, বুড়ির আর কথা বলার লোক থাকে না, ঝিমিয়ে পড়ে। কিছু করতে না পারার জন্য মনে মনে কষ্ট পায়। দেশের জন্য তার দুই ছেলের আত্মত্যাগে তার মন ভরে না, তার সবচেয়ে প্রিয় ছেলে রইস যদি সুস্থ হত তাকেও যুদ্ধে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু তার ছেলে অক্ষম, সেইজন্য তার দুঃখের শেষ নেই। ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য রমজান আলীকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়ে, খুব মার ধোর করে। বুড়ি মনসুর আলীর হাত থাকে মুক্তি পাবার জন্য বড় ছেলের মৃত্যর খবর রটিয়ে দেয়, আনন্দে মনসুরের মন ভরে ওঠে। সে চলে গেলে তার মন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে ওঠে, প্রতিশোধ নিতে চায়, মনসুরকে 'শকুন' বলে সম্বোধন করেছে। কেউ বুড়ির আচরণ বুঝতে পারে না, যেন তাকে ভূতে পেয়েছে। টানাপোড়েনের মধ্যে দিন কাটে "বুড়ির বুকের দিগন্ত অনবরত প্রসারিত হয়। হলদী গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে যায়। গুলির শব্দের জন্য কান খাড়া করে থাকে। দুপদাপ শব্দ হয়, সেটাই বুড়ি চায়।

> "বুড়ি অনুভব করে বুকের সীমানায় গলগলিয়ে জনস্রোত ঢুকছে। ওর ভাবনায় মাঠঘাট প্রান্তর স্বর্ণপ্রসবিনী করে তুলছে। বুড়ির পলিমাটি চেতনায় রাশি রাশি শস্যের কণা।"[১৫]

উপন্যাসের শেষে আমরা বুড়িকে আবার নতুন রূপে পাই। গভীর রাতে রমজান আলীর দুই ছেলে মুক্তি যোদ্ধা কাদের ও হাফিজের নেতৃত্বে হলদী গাঁয়ের মিলিটারি ক্যাম্প অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের লোকেরা খুব ভয় পায় —

> "আশেপাশের ঘরের লোকজনের ফিসফিস কথাবার্তা শোনা যায়, সব ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত, তটস্থ মেয়েরা ছেলে বুকে নিয়ে পালাচ্ছে, পূবদিকে সরে যাচ্ছে, অন্ধকার রাতে পথ চলায় একটুও অসুবিধা হয়না। বরং অন্ধকার ভাল, চারিদিকের এত আধারের মাঝেও বুড়ির বুকের প্রদীপ জ্বলে।"[১৬]

শীতের রাতে আত্মরক্ষার্থে গ্রামের প্রায় সবাই পালিয়ে যায়, রমজান আলীর অনুরোধ করা সত্ত্বেও বুড়ি যায় না। তার আর হারানোর কিছু নেই, ও শেষ দেখতে চায়। সে মনের আনন্দে গুলির শব্দ শোনে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে উপভোগ করে। প্রথমে তাদের পজিশন ভাল ছিল, কয়েকজনকে মেরে ফেলে, কিন্তু তারা সংখ্যায় কম ছিল, তাদের গুলিও ফুরিয়ে যায়। শব্দ থেমে গেলেই বুড়ি হতশায় ভেঙে পড়ে, মুক্তিযোদ্ধেদের হেরে যাওয়া সে মেনে নিতে পারে না, সই নীতাকে উদ্দেশ করে সে বলেছে –

> "সই, ওরা কি হেরে গেল? ওরা হারতে পারে না। আমার বিশ্বাস হয় না।"[১৭]

বুড়ি যখন হতাশায় ভেঙে পড়ে তখন তার উঠানে দুই মুক্তিযোদ্ধা, কাদের ও হাফিজের আবির্ভাব ঘটে, তারা আশ্রয় চায়, মিনতি করে। মিনতির প্রয়োজন নেই, তাদের জীবন গ্রামের জন্য, দেশের জন্য, খুবই মূল্যবা। বুড়ি তাদের জীবনের গুরুত্ব বোঝে।

> "বুড়ি জানে ওদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। হলদী গাঁয়ের প্রাণ এখন ওদের হাতের মুঠোয়। ওদের বাঁচাটা মাটির মত প্রয়োজন।"[১৮]

তাই ওদের নিজের ঘরের কোনে আশ্রয় দেয়। পরিতৃপ্তির হাসি হেসে সে নীতাকে বলে–

> "ওদের না বাঁচালে আমাদের জন্য লড়বে কে?' এই মহৎ কাজ করে বুড়ির মন আনন্দে ভরে ওঠে, নিজের জীবনকে সার্থক করে নেয়। 'গর্বে, ভয়ে, আশংকায়, আনন্দে বুড়ির বুক ওঠা নামা করে' বুড়ি কী করবে ঠিক করতে পারে না, ভাবে, মিলিটারির হাতে নিজেকে সঁপে দিলে ওরা বাঁচবে না কিন্তু ওদের বাঁচা খুবই দরকার। নীতা ভয়ে কাঁদলে বুড়ি রেগে গিয়ে তিরস্কার করে। বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায়ের কথা ভাবতে ভাবতে চারজন মিলিটারি তাদের বাড়িতে চলে আসে পলাতক মুক্তিযোদ্ধাদের ধরতে, যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ে, সার্চলাইটে আলোকিত করে ফেলে চারদিক, বুড়ি ভয় পায়, এত হট্টগোলেও রইস ঘুমায়, ঘুমন্ত ছেলের মুখ থেকে

> মুক্তবাহিনীতে যোগদানকারী হাফিজদের শরীরের গন্ধ অনুভব করে বুড়ি - ওর কেবলই মনে হয় যে ছেলে জনযুদ্ধের অংশীদার হতে পারে না – যে ছেলে ভাইয়ের মৃত্যর প্রতিশোধ নিতে পারে না তার বেঁচে থেকে লাভ কি?”[১৯]

সত্যি লাভ নেই কত লোক মরে যাচ্ছে, রইস যদি মরে যায়—কথাটা ভেবেই তার বুক কেঁপে ওঠে, সে সে ছাড়া আর কোনো সন্তান নেই তার, তার নারী ছেঁড়া একমাত্র ধন।

> “পরক্ষণে সমস্ত হলদী গাঁ চোখের সামনে নড়ে ওঠে। বিরাট একটা ক্যানভাসে বাড়ির শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং সেই সঙ্গে নেংটি পরা মানুষগুলো উঠে আসে সামনে। ওদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, আছে কেবল বুক ভরা তেজ। তাই বুড়ির একার স্বার্থ ওখানে সামান্য।”[২০]

বুড়ি স্বার্থ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, সবার জন্য, দেশের জন্য ঘুমন্ত ছেলেকে বিছানা থেকে তুলে তার হাতে নিজের লুকিয়ে রাখা এল.এম.জি গুঁজে দিয়ে ঘর থেকে তাকে ঠেলে দেয় সৈনিকদের দিকে। নিজে দরজা আগলে রাখে, ঢুকতে হলে বুড়ির লাশ ফেলে ঢুকতে হবে। ওদেরকে বাঁচাতেই ওর এই অত্মত্যাগ, আত্মবলিদান। ওরা হাজার হাজার কলীমের মৃত্যর প্রতিশোধ নিচ্ছে। বুড়ি ছেলের জন্য কাঁদে না, পণ করে দু'টো প্রাণকে রক্ষা করতেই হবে –

> “ওরা হলদী গাঁর স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুদু রইসের মা হতে পারে না। বুড়ি এখন শুধুমাত্র রইসের একলার মা নয়।”[২১]

রইসের আর মা বলে ডাকা হয় না, সে ডাকবেও না, বুড়ির দুঃখের শেষ নেই, নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে-

> “রইস তোর আমার মাতৃত্বে আমার যে অহংকার – হলদী গাঁও আমার তেমন অহংকার। রইস তুই আমাকে মাফ করে দে”[২২]

– এখানেই বুড়ি সাধারণ হয়ে ‘অনন্যা’, ‘আয়োময়’ ও ‘আত্মত্যাগ’ ও সর্বোপরী দেশপ্রেমী হয়ে উঠেছে। এই দেশপ্রেম শিক্ষিত লোকের দেশপ্রেম নয়, এটা সহজাত, নিখাদ – যা কোনো যুক্তি মানে না। বোবা হলেও রইসের জীবনকে কাজে লাগিয়েছে ওর মা, তাকে বিফলে যেতে দেয়নি, তাকেও সে কর্মী করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য একটি মন্তব্য – হাঙর নদী গ্রেনেড আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কতটা আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। এরকম হাজারো ঘটনা না জানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতার পেছনে ... বুড়ি কোনো উপন্যাস নয়, একজন বুড়ি একটি ইতিহাস। আমাদের নয় মায়ের তিতিক্ষার ইতিহাস। এমনকি এ যুগে এসেও নারীরা যেভাবে নিজেদের মুক্তির যুদ্ধ করে যাচ্ছে, বুড়ি সেই যুদ্ধেরও অনুপ্রারণা বলে দাবি করাই যায়।[২৩]

Reference :

১. হাঙর নদী গ্রেনেড : মলাটে বাঁধানো মুক্তিযুদ্ধের আখ্যান, Roarmedia, ৯ই মার্চ, ২০২০
২. তদেব
৩. সেলিনা হোসেন ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’, ৮তম মুদ্রণ, ২০২১ প্রকাশক অনন্যা, বাংলাদেশ, পি ডি এফ কপি, https://porageducation.com পৃ. ৭
৪. তদেব, পৃ. ৮
৫. তদেব, পৃ. ৯
৬. তদেব, পৃ. ৯-১০
৭. তদেব, পৃ. ৫২
৮. তদেব, পৃ. ৫৩
৯. তদেব
১০. তদেব, পৃ. ৫৪
১১. তদেব

১২. তদেব পৃ. ৫৫
১৩. তদেব, পৃ. ৫৭
১৪. তদেব, পৃ. ৫৮
১৫. তদেব, পৃ. ১০৪
১৬. তদেব, পৃ. ১০৫
১৭. তদেব, পৃ. ১০৬
১৮. তদেব, পৃ. ১০৭
১৯. তদেব, পৃ. ১০৮
২০. তদেব
২১. তদেব, পৃ. ১০৯
২২. তদেব, পৃ. ১১১
২৩. হাঙর নদী গ্রেনেড : মলাটে বাঁধানো মুক্তিযুদ্ধের আখ্যান, Roarmedia, ৯ই মার্চ, ২০২০